POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَيۡتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ○ (آل عمران:193)

হে আমাদের প্রভু! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিয়াছ, তাহাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করিয়াছ। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

(আলে ইমরান:১৯৩)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 16

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 16এপ্রিল, 2020 22 শাবান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সব থেকে দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তিরাও আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে এসে অনুশোচিত হয়েছে। এমনটি কিভাবে সম্ভব হল? এটি সেই মহৎ পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল যা সাহাবাগণের মধ্যে যে সংঘটিত হয়েছিল এবং সাহাবাগণের অনুকরণীয় আদর্শ তাদেরকে গভীর অনুশোচনার পথে চালিত করেছিল।

আমার বিশ্বাস অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন প্রভাব ফেলে নি বা তাদেরকে স্তম্ভিত করে নি, যেমনটি সম্মানীয় সাহাবাদের পবিত্র নমুনা ও পরিবর্তন মানুষকে আভিভূত করে তুলেছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি পোষণ করে না, নিঃসন্দেহে সে কৃপণ। আমি যদি কল্যাণ ও মঙ্গলের কোন পথের সন্ধান পাই, তবে কেউ মান্য করুক বা না করুক, সকলের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা আমার কর্তব্য।

কিস বাশুনুদ ইয়া না শুনুদ, মান গুফতুগুয়ে মি কুনাম,

(অর্থাৎ কেউ শুনুক বা না শুনুক আমি বলে যাব।)

জীবনীশক্তিতে ভরপুর কোনও এক ব্যক্তিও যদি উঠে আসে, তবেই ওইটুকুই যথেষ্ট। আমি একথা দ্যীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে পুণ্যলাভের আকাঙ্খায় তোমাদেরকে এই উপদেশ দেওয়া আমার জন্য শোভনীয় নয়। কখনই না! বরং, আমি নিজের মধ্যে এক প্রবল আবেগ ও বেদনা অনুভব করি, যদিও আমার কাছে অজানা যে এই উদ্দীপনার কারণ কি, কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই উদ্দীপনা অদম্য। অতএব আপনারা এই কথাগুলিকে এমন এক ব্যক্তির উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করুন যার সঙ্গে ভবিষ্যতে হয়তো কখনও সাক্ষাত হবে না; অনুরূপভাবে আমার এই উপদেশেগুলিকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করুন যাতে আপনারা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। যারা আমাদের থেকে দূরে আছেন, তাদেরকে আপনার কথা ও কাজের মাধ্যমে অবশ্যই বোঝাতে হবে। যেমনটি আমি ব্যাখ্যা করেছি, যদি তদনুরূপ কর্মের প্রয়োজন না থাকত তবে এখানে কারোর আগমণের প্রয়োজনই বা কি ছিল? আমি তোমাদের মাঝে অপ্রকাশিত পরিবর্তন দেখতে চাই না; বরং এক অসাধারণ রূপান্তর অভিপ্সীত, যাতে বিরুদ্ধবাদীদের মনে অনুশোচনা ভাবের উদয় হয় এবং হঠাৎ করে আলোকপাত হয়। আর তারা আমাদের বিরোধীতায় হতোদ্যম হয়ে পড়ে, কেননা এরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। সব থেকে দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তিরাও আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে এসে অনুশোচিত হয়েছে। এমনটি কিভাবে সম্ভব হল? এটি সেই মহৎ পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল যা সাহাবাগণের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এবং সাহাবাগণের অনুকরণীয় আদর্শই তাদেরকে গভীর অনুশোচনার পথে চালিত করেছিল।

ইকরামার খাঁটি নমুনা

ইকরামা সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। উহদের দুর্দশার পিছনে এরই পরিকল্পনা কাজ করেছিল, যার পিতা ছিল আবু জাহল। কিন্তু অবশেষে সে সাহাবাগণের দৃষ্টান্ত দেখে অনুশোচিত হল। আমার বিশ্বাস, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন প্রভাব ফেলে নি বা তাদেরকে স্তম্ভিত করে নি, যেমনটি সম্মানীয় সাহাবাদের পবিত্র নমুনা ও পরিবর্তন মানুষকে আভিভূত করে তুলেছিল। তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে দেখে আশ্চর্য হয়েছিল। অবশেষে তারা নিজেদের ভ্রান্তি স্বীকার করতে বাধ্য হল। একসময় ইকরামা স্বয়ং আঁ হযরত (সা.)-এর উপরই আক্রমণ করেছিল, আবার এমন সময়ও উপস্থিত হল যখন সে কাফের বাহিনীকে পর্যদুস্ত করেছিল। মোটকথা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সাহাবাগণ যে পবিত্র নমুনা প্রদর্শন করেছিলেন, আমরা আজ সেগুলিকে গর্বসহকারে দলিল ও নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। ইকরামার উদাহরণটিই দেখ। কুফরের যুগে সে কুফর এবং আরও অনেক নিকৃষ্ট অপগুণের অধিকারী ছিল। যেমন-আত্মশ্লাঘা। ইসলামকে পৃথিবী থেকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার তার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু খোদা তা'লার কৃপায় যখন সে ইসলাম লাভের সৌভাগ্য লাভ করল, তখন তার মধ্যে এমন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জন্ম নিল যাতে অহংকার ও আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র ছিল না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৭, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জরুরী ঘোষণা

যে সমস্ত সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কে পত্র লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

তাদের সমস্ত চিঠি যথারীতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। তথাপি কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে চিঠির উত্তরদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) আপনাদের পত্র পাঠ করার পর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। এই অতিমারি এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। সকলকে নিজ নিরাপত্তা ও শান্তির বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকলের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি থাকুক। (মুনীর আহমদ জাভেদ, প্রাইভেট সেক্রেটারী)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

মূল (উর্দু) : ফরিদ আহমদ নবীদ অনুবাদ: মোরতোজা আলি (বড়িশা)

(শেষ পর্ব)

এখন আমার জীবন এক নতুন পথে চলতে লাগল। আমার সবচেয়ে বেশী মনস্কামনা এই ছিল যে, বেশিরভাগ সময় রসুল করীম (সাঃ) এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করি। অতএব আমি কিছু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মসজিদ নববী সংলগ্ন একটি চত্বরের উপর উপস্থিত থাকতাম যেখানে সর্বদা ধর্মীয় কথাবার্ত্তা হত এবং যখন হুজুর (সাঃ) আগমন করতেন তখন আমরাও তাঁর (সাঃ) এর সেবায় নিয়োজিত হয়ে যেতাম। আরবী ভাষায় চত্বরকে 'সুফফা' বলে, এইজন্য লোকেরা আমাদের নাম 'আসহাবে সুফফা' রেখে দিয়েছিল। এটা আমার জীবনের মূল্যবান সময় ছিল, কেননা একদিকে আমার প্রিয় নবীর নৈকট্য ও ভালোবাসা ছিল, অপর দিকে সকল প্রকার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি ও শুধু ধর্ম্মের জন্য সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছিলাম। কিন্তু আগামী দিনে অনেক দায়িত্ব ও কাজ আমাদের উপর ন্যস্ত হওয়ার ছিল। আর এই সবের সূচনা ৫ম হিজরির শওয়ালে আহ্যাব বা খন্দকের যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। যেখানে আল্লাহতা'লার অশেষ কৃপায় আমি প্রচুর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হুজুর আকরম (সাঃ) এই সংবাদ পেলেন যে, মক্কার কাফেররা অনেক গোত্রকে নিজেদের সাথে একত্রিত করে একটি বড় সৈন্যদল গঠন করে মদীনার উপর আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রায় ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) সৈন্য সম্বলিত এই সৈন্যদলের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইবার মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হবে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল, এইজন্য হুজুর আকরম (সাঃ) আল্লাহতা'লার নির্দেশে "শাওয়েরহুম্ ফিল্ আমর্" এর বিবেচনায় সমস্ত সাহাবাগণকে পরামর্শ করার জন্য একত্রিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। আমি মদীনা শহরের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। এবং এটাও জানতাম যে, এতবড় সৈন্যদলের মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিবর্তে তাকে অন্য কোনভাবে প্রতিহত করা যথোপযুক্ত হবে। অতএব আমি ইরানীয় যুদ্ধের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হুজুর আকরম (সাঃ) এর সমীপে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলাম যে, যদি মদীনার উত্তর প্রান্তে একটি প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়, তাহলে শহরকে রক্ষা করা যেতে পারে, কেননা উত্তর দিকটা একমাত্র এমন ছিল যেদিক দিয়ে কোন বড় সৈন্যদল আক্রমণ হানতে পারত, কিন্তু মদীনার অন্যান্য প্রান্ত থেকে ভৌগলিক কারণে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। হুজুর (সাঃ) এই পরিকল্পনার সবদিক বিবেচনা করে এটা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন এবং পরিখা খননের নির্দেশ দিয়ে এই কাজ সাহাবাদের বিভিন্ন দলকে ন্যস্ত করলেন এবং নিজ তত্বাবধানে জায়গা চিহ্নিত করে কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ দিলেন।

প্রচণ্ড শীত ছিল। কিন্তু সাহাবারা নিজেদের প্রিয় নবী (সাঃ) এর নির্দেশ সম্পাদন করতে দিন রাত এক করে এই কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। আর এই সব দেখে তাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রিয় মালিকও প্রতি মুহূর্ত তাদের সাথে এইসব কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তত্বাবধান করার সাথে সাথে স্বয়ং নিজ হাতে কাজ করছিলেন। এইরূপে অবিরত ছয় দিন রাত কাজ করে এই পরিখা সম্পূর্ণ হল। আর যখন কাফেদের বিশাল সৈন্যবাহিনী মদীনাকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছিল তারা এখানে পৌঁছে বিস্ফারিত চোখে বিস্মিত হয়ে রইল। এত বিশাল লম্বাও চওড়া পরিখা অতিক্রম করা তাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল, তাই বাধ্য হয়ে সেখানেই পরিখার নিকট অস্থায়ী শিবির স্থাপন করল এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে লাগল। হুজুর আকরম (সাঃ) ও তিন হাজার সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে এদিকে শিবির স্থাপন করলেন এবং কাফেরদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

মক্কার কাফেররা মদীনা অবরোধ করে এমন জায়গার অনুসন্ধান আরম্ভ করল যেখান থেকে মদীনা আক্রমণ সম্ভব হয় এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে মদীনা সংলগ্ন ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজাকে ও একসঙ্গে করে নিল অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে এই সব গোত্রের যুদ্ধ না করার এমন-ই সন্ধি হয়েছিল। মদীনার বাহিরে অবস্থানকারী একটি বিশাল সেনা বাহিনী ও মদীনার ভিতর থেকে বনু কোরাইজার বিশ্বাসঘাতকতা বাহ্যত যুদ্ধের ছক সম্পূর্ণরূপে কাফেরদের অনুকূলে নিয়ে গিয়েছিল এবং দুর্বল ঈমানের লোকজন ও মুনাফেক (কপট) রা প্রকাশ্যে বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি ভুল সাব্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে পরিপূর্ণ মোমেনগণ (বিশ্বাসি) আল্লাহতা'লার উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং জানতেন অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন এটা অমোঘ সিদ্ধান্ত যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন এবং শত্রুরা বিফল মনোরথ হবে। সুতরাং যেমন যেমন বাহ্যিক আশা আকাঙ্খা শেষ হতে চলেছিল খোদাতা'লার উপর তাদের ঈমান আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল।

শত্রুপক্ষ পূর্ণশক্তি সহকারে আক্রমণ করার চেষ্টায় দিনরাত নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ছোট ছোট আক্রমণ ব্যতীত যাতে কিছু প্রাণহানীও হয়েছে, তাদের দ্বারা বড় আক্রমণ সম্ভব হয়নি। দিন এমনি ভাবে কাটতে লাগল এবং যৌথ বাহিনির উৎসাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল । এই সৈন্যদল যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের একটি সম্মিলিতরূপ ছিল এবং মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা ভিন্ন পারস্পরিক ভালবাসার অন্য কোন কারণ তাদের মধ্যে ছিল না। যেমন যেমন দিন অতিবাহিত হতে লাগল পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে থাকল এবং অবশেষে সৈন্যদলে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা দিল। এবং ঠিক সেই রাতে এই অবিশ্বাস যখন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল খোদাতা'লার পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড় বইতে থাকল যার দ্বারা কাফেরদের ছাউনিতে অস্থিরতা আরম্ভ হয়ে গেল। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে তাঁবু ফেটে গেল। তাঁবুর বেড়া ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বালি, মাটি ও কাঁকর মিলে যেন বৃষ্টির মত কাফেরদের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। ঐ সমস্ত অগ্নিকুণ্ডও নিভে গেল যা সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন হিসাবে প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত লোকেদের যাদের অন্তরে প্রথম থেকে একে অপরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল তারা ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং সেই সৈন্যদল যারা মদীনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিল, সকাল হওয়ার পূর্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে পালিয়ে গেল।

আমি গ্রামে গঞ্জে সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হলাম। প্রতিটি সুখ স্বাচ্ছন্দে হুজুরের সমক্ষে থাকতাম এবং যতদূর সম্ভব তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতাম। এই সময় যা আমি আমার প্রিয় মালিকের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি, সেটা আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি ও সম্পদ ছিল। কিন্তু আমার এই ধারণাই ছিল না, একদিন আমার জীবদ্দশায় প্রিয় নবী (সাঃ) এর বিচ্ছিন্নতার দিন দেখতে হবে। মক্কা বিজয়, ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণতা লাভ করল। লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল এবং অতঃপর একদিন অকস্মাৎ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বিদায় গ্রহণ করে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর নিকট হাজির হয়ে গেলেন। পৃথিবী যেন আমার নিকট অন্ধকার হয়ে গেল। অন্যান্য সাহাবাদের ন্যায় আমিও গভীর শোকে বিহ্বল হয়ে গেলাম এবং এক মুহূর্তের জন্য এই রকম মনে হল যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে আল্লাহতা'লা খেলাফতে রাশেদার মাধ্যমে আমাদের ভয় ভীতিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করে দিল এবং ইসলাম উন্নতি করতে লাগল। কিন্তু মদিনায় আমার প্রেমাস্পদের স্মরণে এত কষ্ট পেতাম যে, মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। পরবর্তীতে যখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর যুগে ইরাকে বসবাস করার সুযোগ পেলাম, আমি ইরাকে বসবাস গ্রহণ করলাম যাতে করে আমি একদিকে বিভিন্ন অভিযানে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হতে পারি এবং অন্যদিকে সেখানে নও মুসলিমদের শিক্ষা দীক্ষার কাজ করতে পারব। ইরাক ও ইরানের যুদ্ধাভিযানে আমার অংশ গ্রহণ ইসলামি সৈন্যদলের জন্য এইদিক দিয়ে উপযুক্ত ছিল, আমার ঐ সব অঞ্চল সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান ছিল এবং ফারসি ভাষা জানার কারণে নিজ দেশবাসীকে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে পারতাম।

আমি নিজ যোগ্যতানুসারে এবং আল্লাহতা'লা প্রদত্ত সামর্থ্যানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করছিলাম এবং স্বীয় কাজে সন্তুষ্ট ছিলাম যে, যুগ খলিফার পক্ষ থেকে এক বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। যদিও এটা অনেক বড় কাজ ছিল। কিন্তু শুধু আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে আমি এই দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার প্রচেষ্টা এই ছিল, ঐ সেবার বিনিময়ে যা কিছু বেতন পাব, সেটা খোদাতা'লার রাস্তায় খরচ করে দিব এবং নিজ হাতে পরিশ্রম করে জীবিক উপার্জ্জন করব। সুতরাং আমি গভর্নর হওয়া সত্বেও বস্তা তৈরী করে বিক্রি করতাম ও এই উপার্জ্জিত অর্থে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতাম। হযরত ওমর (রাঃ) যখন এই সম্বন্ধে অবগত হলেন, তখন তিনি সহানুভূতির খাতিরে আদেশ দিয়ে এই কাজ বন্ধ করে দিলেন।

আমি সরল সহজ প্রকৃতির লোক ছিলাম। অতএব গভর্নর হওয়ার পর আমি একই আচার-ব্যবহার বজায় রেখেছিলাম এবং কখনও আমি মনে মনে

এরপর শেষ পৃষ্ঠায়....

জুমআর খুতবা

যে ব্যক্তি কোনও শহীদকে চলমান অবস্থায় দেখার বাসনা রাখে সে তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে দেখুক।

নবী করীম (সা.)-এর কাছে ‘ফাইয়ায’ (খুব বেশী দানশীল) উপাধি লাভকারী, নিজের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার অধিকারী, ‘মান কাযা নাহ্বাহু’-এর সত্যায়নস্থল এবং যিনি উহদের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)কে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের হাতকে পঙ্গু করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ সভার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, সেই বদরী সাহাবী হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা.)-এর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা।

কোরোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে এবং অপরকে রক্ষা করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়ার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ১৩ই মার্চ, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৩ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:আজ যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্। হযরত তালহা বনু তায়েম বিন মুর্‌রা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল উবায়দুল্লাহ্ বিন উসমান আর মায়ের নাম ছিল সা’বা, যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন ইমাদ হাযরামীর কন্যা এবং হযরত আলা বিন হাযরামীর বোন ছিলেন। হযরত তালহার ডাকনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। হযরত আলা বিন হাযরামীর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন ইবাদ হাযরামী। তিনি হাযার মওতের অধিবাসী ছিলেন এবং হার্‌ব বিন উমায়্যার মিত্র ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি আমৃত্যু বাহরাইনের শাসক ছিলেন। তিনি ১৪ হিজরী সনে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার এক ভাই আমের বিন হাযরামী বদরের যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয় এবং অপর ভাই আমর বিন হাযরামী মুশরেকদের মাঝে প্রথম ব্যক্তি ছিল যাকে কোন মুসলমান হত্যা করেছিল আর সর্বপ্রথম তার সম্পদই মালে গণিমত বা খুমুস’ হিসেবে ইসলামের হস্তগত হয়।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬০)

হযরত তালহার বংশ সপ্তম পুরুষে মুর্‌রা বিন কা’বের ব্যক্তিত্বে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। আর চতুর্থ পুরু ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়। তার পিতা উবায়দুল্লাহ্ ইসলামের যুগ পান নি, কিন্তু মা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে মহিলা সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। হিজরতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(গোলাম বারি সাইফি প্রণীত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৮)

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে গণিমতের মাল থেকে অংশ প্রদান করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণ না করার যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরাইশ-কাফেলার সিরিয়া থেকে যাত্রা করার বিষয়টি আঁচ করতে পেরে নিজের রওয়ানা হওয়ার দশ দিন পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-কে কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। উভয়ে রওয়ানা হয়ে ‘হওরা’নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে অপেক্ষমান থাকেন যতক্ষণ না নিকটবর্তী স্থান দিয়ে কাফেলা অতিক্রম করে। ‘হওরা’ লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি যাত্রাবিরতিস্থল, যে স্থান দিয়ে হিজায ও সিরিয়াগামী কাফেলাগুলো যাতায়াত করত। যাহোক হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ (রা.)-এর ফিরে আসার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই সংবাদ পেয়ে যান। তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদের ডেকে কুরাইশদের কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু, কাফেলা ভিন্ন এক পথ অর্থাৎ উপকূলীয় পথে দ্রুত প্রস্থান করে, পূর্বেও একস্থানে এর উল্লেখ হয়েছে। আর কাফেলা সন্ধানী দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টায় দিন-রাত সফর করতে থাকে, এটি মক্কার কাফিরদের কাফেলা ছিল। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-কে উক্ত কাফেলা সম্পর্কে অবগত করার জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বদরের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.)-এর রওয়ানা হওয়ার বিষয়ে এই দু’জনের জানা ছিল না। তারা মদিনায় সেদিন পৌঁছেন যেদিন মহানবী (সা.) কুরাইশ বাহিনীর সাথে বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ করেছেন। তারা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হওয়ার জন্য মদিনা থেকে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ‘তুরবান’ নামক স্থানে তাঁর সাথে মিলিত হন। তুরবানও মদিনা থেকে উনিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা, যেখানে মিষ্টি পানির অনেক কূপ রয়েছে। বদরের যুদ্ধে যাওয়ার পথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদেরকে বদরের যুদ্ধের গণিমতের মাল থেকে অংশ প্রদান করেন। অতএব তাদের দুজনকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২)

হযরত তালহা উহুদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই দশ জনের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন অধিকন্তু সেই আট ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সেই পাঁচ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুরা কমিটির ছয় সদস্যের একজন ছিলেন। তারা এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭) (আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

ইয়াযীদ বিন রোমান রেওয়ায়েত করেন যে, একবার হযরত উসমান ও হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ উভয়ে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর পিছনে বের হন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের সামনে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন এবং তাদের দুজনকে কুরআন পড়ে শুনান, অধিকন্তু তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে অবগত করেন এবং এ দু'জনকে সেই সম্মান ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হবে। এর ফলে তারা উভয়ে অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) ও হযরত তালহা (রা.) ঈমান আনয়ন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যায়ন করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অতি সম্প্রতি আমি সিরিয়া থেকে ফিরে এসেছি। ফেরার পথে যখন 'মাআন' ও 'যারকা'র মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছি ('মাআন'একটি জায়গার নাম যা মুতার পূ র্বে অবস্থিত, মুতার যুদ্ধের সময় এখানে পৌঁছে মুসলমানরা জানতে পারে যে, রোমানদের দুই লক্ষ সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তখন সাহাবীরা এখানে দুই দিন অবস্থান করেন। আর 'যারকা'ও আরেকটি জায়গা যা 'মাআন' এর পাশেই অবস্থিত) যাহোক তিনি (রা.) বলেন, ফিরতি পথে আমি যখন 'মাআন' ও 'যারকা'র মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছি, সেখানে আমরা যাত্রাবিরতি দিই। আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এক ঘোষক ঘোষণা করে, হে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা! জাগ্রত হও, কেননা আহমদ মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমরা আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০) (ফারহাযেগ সীরাত, প্রণেতা ফজলুর রহমান, পৃ:২৭৯, যোয়ার একাডেমি পাবলিকেশন,করাচী)

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে আমি 'বুসরা'র বাজারে উপস্থিত ছিলাম,'বুসরা' সিরিয়ার অনেক বড় একটি শহর, মহানবী (সা.) তাঁর চাচার সাথে বানিজ্য সফরের সময় এই শহরে অবস্থান করেছিলেন,এমন সময় এক ইহুদি যাজক তাদের 'সওমা' বা গীর্জায় বলছিল যে, কাফেলার লোকদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মাঝে কোন হেরেমবাসী বা মক্কাবাসী আছে কিনা। একথা শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি আছি। তখন সে জিজ্ঞেস করে, আহমদের আবির্ভাব হয়ে গেছে কি? হযরত তালহা (রা.) বলেন, কোন আহমদ? তখন সে বলে, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এটিই সেই মাস যে মাসে তাঁর আবির্ভাব হবে আর তিনি শেষ নবী হবেন, তাঁর আবির্ভাবের স্থান হলো হেরেম বা মক্কা এবং তাঁর হিজরতের স্থান হবে খেজুরের বাগান বিশিষ্ট এবং পাথুরে, নোনা ও অনুর্বর ভূমি, তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না।হযরত তালহা (রা.) বলেন, সে যা কিছু বলেছে তা আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি দ্রুত রওয়ানা হয়ে মক্কায় চলে আসি। এসে জিজ্ঞেস করি, নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে কি? লোকজন বলে, হ্যাঁ! মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ আমীন [মক্কার লোকেরা তাঁকে (সা.) আমীন বলে ডাকত] নবুওয়তের দাবি করেছে আর ইবনে আবি কাহাফা [এটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপনাম ছিল] তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা হই এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আসি এবং জিজ্ঞেস করি, আপনি কি এই ভদ্রলোকের অনুসারী হয়েছেন? তখন তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ! তুমিও তাঁর কাছে চল এবং তাঁর অনুসরণ কর, কেননা তিনি সত্যের দিকে আহ্বান করেন। হযরত তালহা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেই যাজকের সংলাপ শুনান। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তালহা (রা.)-কে সাথে নিয়ে বের হন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট তাকে উপস্থিত করেন। হযরত তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহুদি যাজক যা বলেছিল সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬১)

ইতিহাসের গ্রন্থ তাবাকাতুল কুবরাতে এ বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে। হযরত তালহা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নওফেল বিন খুয়ায়লিদ বিন আদবিয়া তাঁকে এবং হযরত আবু বকরকে এক রশিতে বেঁধে ফেলে। এ কারণেই তাঁকে এবং হযরত আবু বকরকে কারিনাইন তথা দুই সাথীও বলা হতো। নওফেল কুরাইশদের মাঝে নিজের কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিল। তাদেরকে যারা বেঁধেছিল তাদের মাঝে তার ভাই অর্থাৎ হযরত তালহার ভাই উসমান বিন উবায়দুল্লাহও ছিল। তাদেরকে এ কারণে বাঁধা হয়েছিল যেন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতে না পারেন এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন। ইমাম বায়হাকী লিখেছেন, মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আদবিয়ার অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা কর।

(গোলাম বারি সাইফি প্রণীত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৯-১৩০)

হযরত মাসঊদ বিন খিরাশ বর্ণনা করেন, আমি একদিন সায়ী বাসাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম অনেক লোক এক যুবকের পিছু নিয়েছে, যার হাত তার ঘাড়ের সাথে বাঁধা ছিল। আমি জানতে চাইলাম, তিনি কে? লোকেরা উত্তরে বলল, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ বিধর্মী হয়ে গেছে আর তার মা সওবা ক্রোধবশত গালমন্দ করতে করতে তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল।

(আত্তারিখুস সাগীর লি ইমাম বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৩)

আব্দুল্লাহ বিন সা'দ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করার সময় খাররার নামক স্থান থেকে যাত্রা করেন, (এটিও একটি উপত্যকা যা হিজাযের নিকটে অবস্থিত এবং এটিও বলা হয় যে, এটি মদিনার উপত্যকাগুলোর মাঝে একটি উপত্যকা) প্রভাতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সা থে সাক্ষাৎ হয় যিনি সিরিয়া থেকে কাফেলার সাথে এসেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিরিয়ার কাপড় পরিধান করালেন এবং মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন যে, মদিনাবাসী দীর্ঘক্ষণ থেকে অপেক্ষমান। মহানবী (সা.) চলার গতি বাড়িয়ে দেন এবং হযরত তালহা মক্কায় চলে যান। যখন তিনি নিজ কাজ সমাপ্ত করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে মদিনায় পৌঁছে যান।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬১)

হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মহানবী (সা.) হিজরতের পূর্বে তাদের উভয়ের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। মুসলমানরা যখন হিজরত করে মদিনায় পৌঁছে তখন মহানবী (সা.) হযরত তালহা এবং হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

অপর এক উক্তি অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত তালহা এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন এবং তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়েত হলো, হযরত তালহা এবং হযরত উবাই বিন কা'বের মাঝে তিনি (সা.)ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত তালহা যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি হযরত আসাদ বিন যুরারার বাড়িতে অবস্থান করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫) (আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২)

হযরত তালহা'র কতক আর্থিক কুরবানীর কারণে মহানবী (সা.) তাকে 'ফাইয়ায' আখ্যা দিয়েছিলেন অর্থাৎ বিরাট দানশীল। যেমন যি-কারদ এর যুদ্ধাভিযানকালে মহানবী (সা.) একটি ঝর্ণার পাশ দিয়ে যান। তখন মহানবী (সা.) উক্ত ঝর্ণার বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁকে (সা.) বলা হয় যে, সেই কূপের নাম বেসান এবং এর পানি লবণাক্ত। তিনি (সা.) বলেন, না বরং এর নাম নো'মান এবং এর পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ সেই কূপ ক্রয় করে নেন এবং তা উৎসর্গ করে দেন। আর সেই কূপের পানি সুমিষ্ট হয়ে যায়। যখন হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং এই ঘটনা বর্ণনা করেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে তালহা! তুমি তো বড়ই 'ফাইয়ায' (অর্থাৎ দানশীল)। এরপর থেকে তাকে তালহা ফাইয়াজ নামে ডাকা হতে থাকে।

মূসা বিন তালহা নিজ পিতা তালহার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) উহুদের দিন হযরত তালহার নাম রেখেছিলেন 'তালহাতুল খায়ের'। তাবুকের যুদ্ধাভিযান এবং যি-কারদ এর যুদ্ধাভিযানে 'তালহাতুল ফাইয়ায' নাম রেখেছিলেন আর হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের দিন 'তালহাতুল জুদ' রেখেছিলেন যার অর্থও 'ফাইয়ায' তথা বিরাট দানশীল।

(আসসীরাতুল হালাবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮) উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫)

সায়েব বিন ইয়াযিদ কর্তৃক বর্ণিত যে, আমি সফরে এবং অন্য সময়েও হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে ছিলাম কিন্তু সাধারণভাবে অর্থ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে হযরত তালহার চেয়ে অধিক উদার কোন ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নি।

(আত্তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৭)

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে জীবন বাজি রাখার শর্তে বয়াত নেন যখনকিনা মুসলমানরা বাহ্যত কিছুটা পিছপা হয়ে গিয়েছিল। তখন তারা দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)- এর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, এমনকি তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন শহীদ হয়ে যান। বয়াতকারীদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত তালহা, হযরত সা'দ, হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ এবং হযরত আবু দাজানা (রা.)।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১)

হযরত তালহা (রা.) উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সেদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে অবিচল ছিলেন এবং তাঁর (সা.) হাতেমৃত্যুর শর্তে বয়াত করেন। মালেক বিন যুহায়ের মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করলে হযরত তালহা (রা.) নিজের হাত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা সুরক্ষিত রাখেন। তির তার কনিষ্ঠাতেবিদ্ধ হয় যার ফলে সেটি অকেজো হয়ে যায়। প্রথম তিরটি যখন বিদ্ধ হয় তখন ব্যথায় তিনি উহ্ শব্দ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি যদি বিসমিল্লাহ্ বলতেন তাহলে এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতেন যখন মানুষ তার প্রতি তাকিয়ে থাকত। যাহোক, ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা (রা.)-এর মাথায় এক মুশরিক দুইবার আঘাত করে। প্রথমবার যখন তিনি তার দিকে যাচ্ছিলেন এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি দিক পরিবর্তন করছিলেন। এর ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২-১৬৩)

এই ঘটনারবিস্তারিত বিবরণ সীরাতুল হালবিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কায়েস বিন আবু হাযেমাহ্ বলেন, আমি উহুদের (যুদ্ধের) দিন হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র হাত দেখেছিলাম যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তির থেকে বাঁচাতে গিয়ে বিকল হয়ে গিয়েছিল। একটি ভাষ্যানুসারে তাতে বর্শা লেগেছিল এবং এর ফলে এত রক্তক্ষরণ হয় যে, তিনি দুর্বলতার কারণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার মুখে পানির ছিটা দেন যতক্ষণ না তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। সংজ্ঞা ফেরার সাথে সাথে তিনি প্রশ্ন করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেমন আছেন? হযরত আবু বকর তাকে বলেন, তিনি (সা.) ভালো আছেন আর তিনি-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত তালহা বলেন, **'আলহামদুলিল্লাহ্- কুল্লু মুসিবাতিন বা'দাহু জালাল'** । অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার! তিনি (সা.) যদি নিরাপদ থাকেন তাহলে সকল বিপদই তুচ্ছ।

(আসসীরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

এই যুদ্ধেরই একটি ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত যুবায়ের বর্ণনা করেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের দিন দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) পাহাড়ে আরোহনের চেষ্টা করেন, কিন্তু লৌহ-বর্মের ভারে এবং মাথা ও মুখমণ্ডলের আঘাতের ফলে রক্তপাতের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, পাথরের উপর উঠতে পারছিলেন না; তিনি (সা.) যে আঘাত পেয়েছিলেন এটি তার পরের ঘটনা। তিনি (সা.) হযরত তালহাকে নিচে বসান এবং তার উপরে পা রেখে পাথরের উপর আরোহন করেন। হযরত যুবায়ের বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তালহা নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫) (আসসীরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২১)

আরেকটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত তালহার একটি পা কিছুটা পঙ্গু ছিল, যে কারণে তিনি সঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। তিনি যখন মহানবী (সা.) কে ওঠান, তখন অনেক চেষ্টা করে নিজের ভারসাম্য ও নিজের পা ঠিক রাখছিলেন, যেন তার পঙ্গু হওয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর কোন কষ্ট না হয়। এরপর তার পঙ্গুত্ব চিরতরে দূর হয়ে যায়।

(আসসীরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২২)

আয়েশা ও উম্মে ইসহাক, যারা হযরত তালহা (রা.)-এর কন্যা ছিলেন, তারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে আমাদের পিতার চব্বিশটি আঘাত লাগে, যার মধ্যে একটি চৌকোণ বিশিষ্ট আঘাত মাথায় ছিল এবং পায়ের শিরা কেঁটে গিয়েছিল, আঙুল বিকল হয়ে গিয়েছিল এবং বাকি আঘাতগুলো ছিল দেহে। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সামনের দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারাও ক্ষতবিক্ষত ছিল। তিনি (সা.)-ও প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হযরত তালহা (রা.) তাকে (সা.) নিজের পিঠে উঠিয়ে এমনভাবে উল্টো পায়ে পিছু হটেন যে, কোন মুশরিক এগিয়ে আসলে তিনি তার সাথে যুদ্ধ করতেন। আর এভাবে তিনি তাঁকে (সা.) উপত্যকায় নিয়ে যান এবং হেলান দিয়ে বসিয়ে দেন। এটি তাবাক্বাতুল কুবরা'র উদ্ধৃতি।

(আত্তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৩)

উহুদের যুদ্ধের দিন যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলমান দের উপর অতর্কিত হামলা করেন এবং মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, হযরত মুসলেহ্ ম ওউদ (রা.) বিভিন্ন রেওয়ায়েতের আলোকে এর বিস্তারিত চিত্রাঙ্কন করেছেন, এটি আসলে বিগত ঘটনাসমূহেরই বিশদ বিবরণ, যা হযরত তালহা (রা.) এর দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের মানের এক অদ্ভুত চিত্র উপস্থাপন করে। পূর্বেআমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি– তা থেকেই এই মান দৃষ্টিগোচর হয়। যাহোক, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এরূপ। তিনি বলেন,

"কতিপয় সাহাবী ছুটে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর চারপাশে একত্রিত হয়ে যান, যাদের সংখ্যা খুব বেশি ত্রিশ হবে। কাফেররা সেই জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় যেখানে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। একের পর এক সাহাবী তাঁর (সা.) সুরক্ষায় নিহত হচ্ছিলেন। তরবারিধারীদের পাশাপাশি তিরন্দাজরা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) এর প্রতি অজস্র তির বর্ষণ করছিল। তখন তালহা (রা.), যিনি কুরাইশদের মধ্য থেকে ছিলেন এবং মক্কার মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এটি দেখে যে, শত্রুরা সমস্ত তির মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা লক্ষ্য করে ছুঁড়ছে; নিজের হাত রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পবিত্র চেহারার সামনে বাড়িয়ে দেন। একের পর এক তির, যা লক্ষ্যভেদ করত তা হযরত তালহার হাতে বিদ্ধ হতো, কিন্তু বীর ও বিশ্বস্ত এই সাহাবী নিজের হাতকে বিন্দুমাত্রও নড়াতেন না। এভাবে তির বিদ্ধ হতে থাকে আর হযরত তালহার হাত ক্ষতের তীব্রতার কারণে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায় এবং তার কেবলএকটি হাত অবশিষ্ট রয়ে যায়। বহু বছর পর ইসলামের চতুর্থ খিলাফতের যুগে যখন মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয় তখন কোন শত্রু তিরস্কারের ছলে হযরত তালহাকে একহাতা বলে। এতে আরেকজন সাহাবী বলেন একহাতি তো বটেই; কিন্তু কতই না কল্যাণমণ্ডিত একহাতি ব্যক্তি। তুমি কি জান তালহার এই হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার নিরাপত্তাবিধানে পঙ্গু হয়েছিল? উহুদের যুদ্ধের পর কোন ব্যক্তি তালহাকে জিজ্ঞেস করে, যখন তির আপনার হাতে বিদ্ধ হতো তখন কি আপনার ব্যথা লাগতো না আর আপনার মুখ থেকে কি উফ্ শব্দ বের হতো না? তালহা উত্তর দেন, ব্যথাও হতো এবং উফ্ শব্দও বের হওয়ার উপক্রম হতো, কিন্তু আমি উফ্ করতাম না, পাছে উফ্ শব্দ করার সময় আমার হাত নড়ে গিয়ে তির রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর পবিত্র চেহারায় বিদ্ধ হত।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫০)

হামরাউল আসাদ যুদ্ধে পিছু ধাওয়ার সময় মহানবী (সা.) এর সাথে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হয়। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তালহা! তোমার অস্ত্র কোথায়? হযরত তালহা নিবেদন করেন, নিকটেই রয়েছে; এটা বলে তিনি দ্রুত গিয়ে নিজের অস্ত্র উঠিয়ে আনেন। অথচ সে সময় তালহার কেবল বুকেই উহুদের যুদ্ধের নয়টি ক্ষত ছিল। তার দেহে সব মিলিয়ে সত্তরটির অধিক ক্ষত ছিল। হযরত তালহা বর্ণনা করেন, আমি আমার ক্ষতের চেয়ে মহানবী (সা.) এর ক্ষতের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ছিলাম। মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন আর জিজ্ঞেস করেন, তুমি শত্রুকে কোথায় দেখেছিলে? আমি নিবেদন করি, নীচু এলাকায়। তিনি বলেন, আমারও এটিই ধারণা। কুরাইশদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, তারা ভবিষ্যতে কখনো আমাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করার সুযোগ পাবে না, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা

আমাদের হাতে মক্কাকে বিজিত করবেন।

(আসসীরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫০-৩৫১)

তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, কতিপয় মুনাফেক সুয়ায়লাম ইহুদির ঘরে একত্রিত হচ্ছে, তার ঘর জাসূম নামক স্থানের নিকটে ছিল। জাসূমকে বি'রে জাসিমও বলা হয়। এটি সিরিয়ার দিকে রা'তেজ এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবু হায়সাম বিন তাইয়্যেহান এর কূপ ছিল আর এর পানি খুবই উত্তম ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও এটির পানি পান করেছিলেন। যাহোক, তারা তার ঘরে একত্রিত হচ্ছিল আর সে মুনাফেকদেরকে তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যেতে বাধা দিচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত তালহাকে কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার কাছে প্রেরণ করেন এবং আদেশ দেন যেন সুয়ায়লামের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হযরত তালহা তা-ই করেন। সাহাক বিন খলীফা ঘরের পেছন দিক দিয়ে পালাতে গেলে তার পা ভেঙে যায় আর তার বাকি সাথিরা পালিয়ে যায়।

(আসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৭) (ফরহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা-ফযলুর রহমান, পৃ: ৮৪)

হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, আমার উভয় কান মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছে যে, তালহা ও যুবা য়ের জান্নাতে আমার দুই প্রতিবেশী হবে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

তাবুকের যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত কা'ব বিন মা'লেক। তাকে বয়কট করা হয়। চল্লিশ দিন পর যখন আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা গ্রহণ করেন এবং ক্ষমার ঘোষণা করা হয় আর তিনি মসজিদে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন হযরত তালহা সামনে এগিয়ে হযরত কা'বের সাথে করমর্দন করেন ও তাকে অভিনন্দন জানান। হযরত তালহা (রা.) ছাড়া বৈঠক থেকে আর কেউ উঠে নি। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি হযরত তালহা (রা.)-এর এই অনুগ্রহ কখনোই ভুলতে পারব না।

(গোলাম বারি সাইফি প্রণীত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নয় ব্যক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতি আর আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও এ সাক্ষ্যই প্রদান করি তাহলে আমি গুনাহ্গার হব না। বলা হলো, এটি কীভাবে সম্ভব? তিনি (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হেরা পাহাড়ে ছিলাম; তখন এটি কাঁপতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে হেরা (পাহাড়)! স্থির থাক, নিশ্চয় তোমার উপরে একজন নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা। হযরত সাঈদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.), আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.); এই হলো নয় জন। জিজ্ঞেস করা হয় যে, দশম ব্যক্তি কে? তিনি খানিকক্ষণ নীরব থাকেন; অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, সেই ব্যক্তি হলাম আমি।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিবু, হাদীস-৩৭৫৭)

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মর্যাদা এত মহান ছিল যে, তারা রণক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মুখে লড়াই করতেন এবং নামাযে তাঁর (সা.)-এর পিছনে দাঁড়াতেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে চলমান অবস্থায় দেখার আকাঙ্ক্ষা রাখে সে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্কে দেখে নিক।

হযরত মূসা বিন তালহা এবং হযরত ঈসা বিন তালহা (রা.) তাঁদের পিতা হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীরা বলতেন, এক বেদুঈন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, **"মান কাযা নাহবাহু"** (সূরা আহযাব:২৪) অর্থাৎ যে তার সংকল্প পূর্ণ করেছে–বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? বেদুঈন যখন তাঁর (সা.) কাছে জিজ্ঞেস করে তখন তিনি (সা.) কোন উত্তর দেন নি। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে তিনি (সা.) উত্তর দেন নি। সে আবার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু তিনি (সা.) উত্তর দেন নি। তিনি বলেন, এরপর আমি (অর্থাৎ হযরত তালহা) মসজিদের দরজা দিয়ে সামনে আসি। আমি তখন সবুজ রঙের পোশাক পরিহিত ছিলাম। যখন মহানবী (সা.) আমাকে (অর্থাৎ হযরত তালহাকে) দেখেন তখন বলেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায় যে জিজ্ঞেস করছিল যে, **"মান কাযা নাহবাহু"** বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? সেই বেদুঈন বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আছি। হযরত তালহা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, দেখ! এ হলো **"মান কাযা নাহবাহু"**-র সত্যয়নস্থল বা সত্যায়নকারী।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

আব্দুর রহমান বিন উসমান (রা.) বলেন, একবার আমরা হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র সাথে ছিলাম। আমরা এহরামে ছিলাম। কোন একব্যক্তি আমাদের কাছে উপহার স্বরূপ একটি পাখি নিয়ে আসে। হযরত তালহা (রা.) তখন ঘুমাচ্ছিলেন। আমাদের মধ্য হতে কয়েকজন সেটি খেয়ে ফেলে আর কয়েকজন তা এড়িয়ে চলে। হযরত তালহা (রা.) জাগ্রত হওয়ার পর যারা সেটি (অর্থাৎ পাখি) খেয়েছিল তাদের সাথে সহমত হন এবং বলেন, আমরাও এহরাম বাঁধা অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে অন্যের শিকার (করা প্রাণি) খেয়েছিলাম।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭)

হযরত উমর (রা.)'র মুক্ত কৃতদাস আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র দেহে দু'টি কাপড় দেখেন যা লাল রঙের মাটিতে রাঙানো ছিল, অথচ তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে তালহা! এই কাপড় দু'টির কী অবস্থা? অর্থাৎ এগুলো রঙিন করলে কেন? তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি তো এগুলো মাটি দিয়ে রাঙিয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে সাহাবীদের দল! তোমরা ইমাম বা নেতা। মানুষ তোমাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করবে। কোন অজ্ঞ যদি তোমার দেহে এই কাপড় দু'টি দেখে তাহলে বলবে, তালহা রঙিন পোশাক পরিধান করেন অথচ তিনি এহরামে আছেন। আপত্তি করবে যে, সাদার পরিবর্তে রঙিন কাপড় পরিহিত আছে, তুমি যে জিনিস দ্বারাই রঙ কর না কেন। অপর একটি রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই শব্দাবলী রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, এহরামকারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম পোশাক হলো, সাদা– তাই মানুষকে সন্দেহে নিপতিত করো না।

হযরত হাসান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) তার একখণ্ড জমি হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)'র কাছে সাত লক্ষ দিরহামে বিক্রি করেন। হযরত উসমান তাকে এই অর্থ পরিশোধ করেন। হযরত তালহা যখন এই অর্থ নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন তখন তিনি বলেন, যদি কারো কাছে সারারাত এই পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত থাকে তাহলে জানা নেই যে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে রাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কী নির্দেশ অবতীর্ণ হ বে, জীবন-মৃত্যুর কোন বিশ্বাস নেই। অতএব হযরত তালহা (রা.) সেই রাতটি এভাবে অতিবাহিত করেন যে, তার দূত সেই সম্পদ বা অর্থ নিয়ে অভাবীদের দেয়ার জন্য মদিনার অলি-গলিতে ঘুরতে থাকে এমনকি যখন সকাল হয় তখন তার কাছে সেই অর্থ থেকে এক দিরহামও আর অবশিষ্ট ছিল না।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৪-১৬৫)

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, হযরত তালহা (রা.) হযরত উসমান (রা.)'র সাথেতখনসাক্ষাৎ করেন যখন তিনি মসজিদ থেকে বাইরে বের হচ্ছিলেন। হযরত তালহা বলেন, আপনার পঞ্চাশ হাজার দিরহাম আমার কাছে ছিল, আমি সেই অর্থ জোগাড় করেছি, আপনি তা নেওয়ার জন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। অর্থাৎ কোন সময় তিনি নিয়েছিলেন, এখন তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন নিয়ে নিন। তখন হযরত উসমান (রা.) তাকে বলেন, আপনার মহানুভবতার কারণে তা আমরা আপনার নামে হেবা করে দিয়েছি।

(আল বাদাহিয়া লি ইবনে আসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭)

হযরত তালহা জামালের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, কায়েস বিন হাযেম কর্তৃক বর্ণিত,মারওয়ান বিন হাকাম জামালের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা'র হাঁটুতে তির নিক্ষেপ করলে তার শিরা

থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। যখন তিনি হাত দিয়ে তা চেপে ধরতেন তখন রক্ত বন্ধ হয়ে যেত আর ছেড়ে দিলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকত। হযরত তালহা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তাদের তির পৌঁছে নি। অতঃপর বলেন, ক্ষতস্থানটিকে ছেড়ে দাও কেননা এই তির আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন।

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌কে জামালের যুদ্ধের দিন ১০ জমাদিউস্ সানি ৩৬ হিজরী সনে শহীদ করা হয়। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তখন তার বয়স ছিল ৬২ বছর।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৭-১৬৮

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আলী এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের-এর কুৎসা করছিল। হযরত সা'দ বিন মালেক অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস তাকে বারণ করেন এবং বলেন, আমার ভাইদের কুৎসা করো না, কিন্তু সে মানে নি। হযরত সা'দ উঠেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এরপর তিনি দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! সে যেসব কথা বলছে তা যদি তোমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে তাহলে আমার চোখের সামনে তার ওপর কোন বিপদ অবতীর্ণ কর এবং তাকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত কর। অতএব সে ব্যক্তি বের হলে এমন এক উটের মুখোমুখি হয় যা মানুষকে বিদীর্ণ করতে করতে আসছিল। সেই উট এই ব্যক্তিকে একটি পাথুরে জমিতে ধরে ফেলে এবং তাকে নিজের বক্ষ এবং ভূমির মাঝে রেখে পিষে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি যে, মানুষ হযরত সা'দের পিছনে এই কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল যে, হে আবু ইসহাক! আপনাকে অভিনন্দন, আপনার দোয়া গৃহীত হয়েছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮)

আলী বিন যায়েদ নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত তালহাকে স্বপ্নে দেখে, যিনি বলছিলেন, আমার কবর অন্যত্র সরিয়ে দাও, পানি আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। একইভাবে সে পুনরায় তাকে স্বপ্নে দেখে। বস্তুত লাগাতার তিন বার দেখার পর সে ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস-এর কাছে আসে এবং তার কাছে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করে। মানুষ গিয়ে তাকে দেখে যে, তার যে অংশ মাটির সাথে মিশে ছিল তা পানিতে ভিজে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। অতএব মানুষ হযরত তালহাকে সেই কবর থেকে বের করে দ্বিতীয় স্থানে দাফন করে। বর্ণনাকারী বলতেন, আমি যেন এখনও সেই কর্পুর দেখতে পাচ্ছি যা তার উভয় চোখে দেয়া ছিল, তাতে আদৌ পরিবর্তন আসে নি। কেবলমাত্র তার চুলে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল, অর্থাৎ সেগুলো নিজ স্থান থেকে সরে গিয়েছিল। মানুষ হযরত আবু বাকারার ঘরগুলোর মধ্য থেকে একটি ঘর দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করে তাতে হযরত তালহাকে দাফন করে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮)

ইরাকের জমিগুলোতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র চার বা পাঁচ লক্ষ দিরহামের ফসল হতো। আর 'সরা' এলাকা, যা আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ী অঞ্চল, এটিকে 'জাবলুস্ সারা'-ও বলা হয়, সেখানে কমপক্ষে দশ হাজার দিনার মূল্যমানের ফসল হতো। তার অন্যান্য জমি থেকেও ফসল আসতো। বনু তায়েম গোত্রের কোন দরিদ্র ব্যক্তি এমন ছিল নাযার এবং যার পরিবারের প্রয়োজন তিনি মেটান নি, তাদের বিধবাদের বিবাহ দেন নি, তাদের রিক্তহস্তদের সেবক প্রদান করেন নি, অর্থাৎ সেবা করার জন্য রিক্তহস্তদেরও সাহায্য করেন, আর তাদের ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করেন নি, অর্থাৎ তাদের সবার ঋণও পরিশোধ করতেন। অধিকন্তু প্রতি বছর ফসল বিক্রি থেকে যে আয় হতো তা থেকে হযরত আয়েশাকে তিনি দশ হাজার দিরহাম পাঠাতেন।

(আত্তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৬) (ফারহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা ফজলুর রহমান, পৃ: ১৪৭)

হযরত মাবিয়া মূসা বিন তালহাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কত পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছেন?তিনি বলেন, বাইশ লক্ষ দিরহাম এবং দুই লক্ষ দিনার। তার পুরো সম্পদ ফসল থেকে লাভ হতো যা বিভিন্ন জমি থেকে আসতো। তার শাহাদাত হয়েছে জামালের যুদ্ধে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিশদ বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে প্রদান করব, কেননা তা পৃথক বর্ণনারই দাবি রাখে, যেন আমাদের মনমস্তিষ্কে যে কতক প্রশ্ন জাগে, সেগুলোর উত্তর লাভহয়। ইনশাআল্লাহ্ তা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন যেমনটি আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের যে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, এর জন্য সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখুন। এছাড়া মসজিদেও যখন আসবেন, সাবধানতার সাথে আসবেন। সামান্য জ্বর ইত্যাদিও যদি থাকে, শারীরিক কোন কষ্ট থাকে তাহলে এমনসব স্থানে যাবেন না যেগুলো জনসাধারণের আনাগোনা স্থল। নিজেরাও নিরাপদ থাকুন এবং অন্যদেরও নিরাপদ রাখু ন। আর দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে বিপদাবলী থেকে রক্ষা করুন।

করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিষেধক হিসেবে

১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

ক) ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200

(খ) Chellidonium Maj -1x

এই দুটি ওষুধ 'ক' এবং 'খ' তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।

৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।

মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30, Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

৩) Chellidonium Maj -1x সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। সর্ব প্রথম আমি সকল অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিগত কয়েক বছর থেকে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। বস্তুত এটি ইসলাম সম্পর্কে অপবাদ ও বিদ্বেষ প্রচার এবং রসুল করীম (সা.)-এর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার এক সম্মিলিত অপচেষ্টা। একটি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আপনাদের উদারতার সত্যায়ন করছে। আমি আপনাদের এই কাজের প্রশংসাই করছি, সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার দোয়া হল এই উদারতা ও সহনশীলতা সর্বদা আপনাদের মধ্যে থাকুক, বরং তা আরও বিকশিত হয়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করুক যাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তি, সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে বসবাস করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা যারা আহমদী মুসলমান, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম হল মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, যার সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে। কোনও ব্যক্তির অপরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অন্যায় কথা বলার কোনও অধিকার নেই। অপরের সম্মানীয় মনীষীদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা উচিত নয়। কেননা মানুষের সঙ্গে ভেদাভেদপূর্ণ ও বিদ্বেষমূলক আচরণের ফলে কেবল দুঃখ কষ্টেরই জন্ম হয়, আরও বেশি ভেদাভেদ তৈরী হয়। এর বিপরীতে সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাকে ভিত্তি করে আমরা শান্তি ও সমন্বয়পূর্ণ এক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি। যেমনটি আমি বলেছি, অমুসলিম বিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে মহানবী (সা.)-এর চরিত্র হনন করা হচ্ছে। আর এখানে হল্যান্ডেও অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রসারে সামনের সারিতে রয়েছে। এরা কুরআন করীম এবং রসুল করীম (সা.)-এর উপর কদর্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে। এরই প্রেক্ষাপটে যতটুকু সময় রয়েছে তাতে আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং ইসলামের প্রবর্তক রসূল করীম (সা.)-এর চরিত্র প্রসঙ্গে কথা বলব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তথাপি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলার পূর্বে মোটামুটিভাবে বলতে চাইব যে, বস্তুত 'শান্তি' কি বস্তু আর কিজন্য তা এতটা গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত স্তরে শান্তি এমন বিষয় যা অর্জনে আমাদের প্রত্যেকেরই বাসনা থাকে। কিন্তু সর্বস্তরে শান্তি বিস্তার এমন একটি বিষয় যা অর্জনের দাবি প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠি করে থাকে। যাইহোক শান্তি কি বস্তু এবং তা আমাদের প্রয়োজন কেন? আমার মতে শান্তি দুই প্রকারের। এক অভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয়টি হল বাহ্যিক শান্তি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অধিকাংশ মানুষ বাহ্যিকভাবে সুখী ও পরিতৃপ্ত হওয়ার ভান করতে পারে, যদিও তারা বাহ্যত সুখী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে শান্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। যেমন শক্তিধর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা প্রায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা মুখে বলে, কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সাচ্ছন্দ ও জাগতিক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই স্বীকার করে যে তারা মানসিক প্রশান্তির সন্ধানে রয়েছে বা তারা মানসিক অবসাদের শিকার। বাহ্যিক এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাছে সে সব কিছুই আছে যা তারা আকাঙ্খা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভয় ও উৎকণ্ঠা তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে, তারা হয় অস্থির চিত্ত। বস্তুত কোনও ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে, তার জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি নিরর্থক হয়ে পড়ে। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে যে, একমাত্র বস্তু যা অর্থ দ্বারা কেনা যায় না সেটি হল আন্তরিক শান্তি। যেমন একজন ধনী মা যার কাছে প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদের স্তুপ রয়েছে, কিন্তু তার সন্তান কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তবে পৃথিবীর সম্ভাব্য সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ থাকা সত্ত্বেও সে উন্মাদ ও আশাহত হয়েই কালাতিপাত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের সন্তানকে খুঁজে পায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আক্ষেপের বিষয় হল উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলিতে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। ধনী দেশগুলিতে অনেক মানুষ আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও আত্মহত্যা করছে। স্নায়ুজনিত রোগের আক্রমণ এবং অবসাদের শিকার হচ্ছে। এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই যে সমাজের দুর্বল ও অসহায় মানুষগুলি যারা নিজেদের প্রাথমিক চাহিদাগুলিও পুরণ করতে পারছে না, তাদের মধ্যেও আন্তরিক প্রশান্তির অভাব পরিলক্ষিত হয় যারা সেই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জনের প্রবল আকাঙ্খা রাখে, যেগুলি ভোগ করে থাকে। কাজেই হতাশা এবং মানসিক অস্থিরতা ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ধনীরা আন্তরিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত, যাদের কাছে প্রয়োজনের সমস্ত জিনিস রয়েছে। অপরদিকে অভাবগ্রস্তরা নিজেদের অস্বচ্ছলতার কারণে বিচলিত আর অন্যদের মত সুখের জীবন পাওয়ার প্রবল আকাঙ্খা রাখে। মানুষের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্খা ভিন্ন হোক বা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মর্যাদা একে অপরের থেকে ভিন্ন হোক, কিন্তু আন্তরিক প্রশান্তি লাভে ব্যর্থতার দিক থেকে তারা সকলেই সম পর্যায়ের।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান কালে সমালোচকেরা ধর্মকে জাগতিক সমস্যাবলীর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে তৎপরতা দেখায়, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে। অথচ অনেক মানুষ যারা মানসিক অস্থিরতার শিকার, তারা ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। কাজেই তাদের সমস্যাবলীর কারণে ইসলাম বা অন্য কোনও ধর্মকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম বর্তমান যুগের সমস্যা নয়, বরং সমস্যাবলীর সমাধান। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এর সমাধান খুবই সরল। রসুল করীম (সা.) আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রকৃত মানসিক প্রশান্তির দাবি হল মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চেনে এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে। কেননা ইসলাম অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর মধ্যে একটি হল তিনি শান্তি ও স্থিরতার উৎস। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির জন্য চান তারা যেন ধর্ম ও মতবাদের উর্দ্ধে এসে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে। তিনি এও শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা, তিনিই অন্নদাতা। তিনি কেবল মুসলমানদের পালনকর্তা নন, বরং তাঁর দয়া হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, ইহুদী নির্বিশেষে সমগ্র মানবতাকে পরিবেষ্টন করে আছে। অন্য কোনও ধর্মের অনুসারীই হোক বা যে কখনও কোন ধর্ম মেনে চলে না, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে, তাদের উপরও তাঁর দয়া ক্রীয়াশীল। ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয়, তারা যেন নিজেদের সকল শক্তিবৃত্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ্ তা'লার গুণকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে। এই কারণেই রসুল করীম (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে বার বার বলেছেন, তারা যেন দয়াবান হয় এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান হয় এবং পরস্পরের প্রতি শান্তি কামনাকারী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের প্রবর্তক একটি সোনালী নীতি বর্ণনা করেছেন। একজন প্রকৃত মুসলমানের উচিত সে যেন অপরের জন্যও তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আমার মতে এই আপাত সরল কিন্তু সুগভীর বিষয়ের উপর আমল করলে কেবল মুসলমানরাই নয় বরং অন্যরাও এই সমাজের দীর্ঘস্থায়ী শান্তির মাধ্যম সাব্যস্ত হবে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেকে নিজের এবং নিজের প্রিয়জনদের জন্য শান্তি কামনা করে। কিন্তু মানুষ যদি দাবি করে যে সে তার বিরুদ্ধবাদী ও প্রতিপক্ষের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করে, তবে এক্ষেত্রে নিশ্চয় অধিকাংশই মিথ্যা কথা বলে।

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এটি হল সেই সততার মান এবং উদারতার স্পৃহা যা ইসলাম দাবি করে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম ও শিক্ষা যা স্বার্থহীনতার প্রসার করে এবং মানবতাকে সকল প্রকার স্বার্থপরতা ত্যাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামের পয়গম্বার এই নীতি বর্ণন করেছেন যে মানুষের উচিত উদার হওয়া, তার সদিচ্ছায় কোনও প্রকার ত্রুটি যেন না থাকে। নিজের জন্য সর্বোত্তম বস্তু কামনা করার পরিবর্তে অন্যের জন্যও একই বস্তু কামনা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পরিতাপের বিষয় হল বর্তমান বিশ্বে আমরা ঠিক এর উল্টোটি দেখতে পাই। ব্যক্তি-স্বার্থ এবং লালসা আধুনিক সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। কলহ, বিশৃঙ্খলা এবং যুদ্ধ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে ন্যায় ও সাম্যের নীতি ক্রমশ উপেক্ষিত হচ্ছে। এই বিষয়টি অনেক ধনী ও শক্তিধর দেশগুলির বিদেশনীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। আধুনিক ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে পরাশক্তিগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে দূর-দূরান্তে নিজেদের সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে যে এর পিছনে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। এই ধরণের বিবাদে যদি তাদের একজন সৈন্যও মারা যায় তবে হাহাকার শুরু করে দেয়, অতঃপর তারা প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেয়। অথচ যখন তাদের বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র শত শত এমনকি হাজার হাজার নিরপরাধ নাগরিকের প্রাণ কেড়ে নেয়, তখন তাদের পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা শোক প্রকাশ পায় না। এই ধরণের অন্যায় সুদূরপ্রসারী এবং ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনবে। স্থানীয় মানুষেরা দেখতে পাচ্ছে যে তাদের জীবনের মূল্য সেই সব শক্তিধর দেশের মানুষের তুলনায় খুবই কম। এই ধরণের দ্বৈত মানদণ্ড এবং বিপন্ন মানবতার কারণে হতাশা, ক্ষোভ এবং ঘৃণা তাদেরকে ঘিরে ধরে। কোনও সময় তাদের এই আবেগ-উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটে যা বিপদ হিসেবে প্রকাশ পায়। সেই সব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু অবশিষ্ট বিশ্ব যদি মনে করে যে এর দ্বারা তারা প্রভাবিত হবে না, তবে এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। কেননা পৃথিবী এখন পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে এক স্থানে সংঘটিত অন্যায়ের প্রভাব অন্যান্য দেশেও পৌঁছে যায়। সাম্প্রতিক অতীতে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমরা যদি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সার্বজনিক স্তরে সত্যিই শান্তি পেতে ইচ্ছুক হই, তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা যেন অন্যদের জন্য সেই সব কিছুই পছন্দ করি যা নিজেদের জন্য পছন্দ করে থাকি। যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তির ভিত্তির এটিই একটি সরল নীতি। যতদূর ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে, আঁ হযরত (সা.) এই শিক্ষা দান করেছেন যে, প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবজাতিকে খোদার উপর ঈমান আনতে হবে, যিনি শান্তিদাতা, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং অতীব পবিত্র সত্তা। অতঃপর তাঁর উত্তম গুণাবলীকে নিজেদের জীবনের অঙ্গে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। এর অর্থ হল মানবজাতিকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামনে না রেখে সত্যনিষ্ঠ হয়ে চেষ্টা করতে হবে। নিঃসন্দেহে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ বিবাদের মূল কারণ সংশ্লিষ্ট দলের উদ্দেশ্য সৎ নয়। তাদের কথা ও কর্মের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে আর যেখানে মানুষের কথা কর্মের অনুরূপ না হয়, সেখানে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ইউরোপীয় দেশ বা মুসলিম বিশ্বের কোনও দেশ হোক বা অন্য যে কোন দেশ ও রাজনৈতিক নেতা- সকলেই এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তক্ষয়ের নিন্দা করে। তথাপি বাস্তব এই যে এই নিন্দা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজেদের মধ্য পর্যন্তই সীমিত থাকে। যারা আইনের শাসন, ন্যায় এবং মানবাধিকার ইত্যাদির বুলি আওড়ায়, যখন তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তখন তাদের এই স্লোগানগুলি ফাঁকা বুলিতে পর্যবসিত হয়। যদি তাদের উপর আক্রমণ করা হয় বা তাদের অধিকার পদদলিত করা হয় তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে। অথচ এরা নিজেরাই দুর্বল দেশগুলিকে আক্রমণ করে আর নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই সব দেশে গৃহযুদ্ধ এবং অরাজকতা ছড়ানোর জন্য দায়ী। বিভিন্ন পক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করা বা ন্যায়ভিত্তিক আলোচনার জন্য তাদেরকে আহ্বান করার পরিবর্তে শক্তিধর দেশগুলি সবসময় অপর দেশের বিবাদে হস্তক্ষেপ করে থাকে আর সেই পক্ষকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে থাকে যারা তাদের স্বার্থরক্ষা করে চলে। এগুলি সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার নামান্তর হয়ে থাকে, পরিণামে নিরপরাধ আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রাণ হারাচ্ছে আর তাদের পরিবারের মানুষদের কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। শহর, গ্রাম ও বিভিন্ন জনপদে আক্রমণ করে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এর অনিবার্য পরিণাম হিসেবে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের যুদ্ধকবলিত মুসলমান দেশগুলিতে এই বিষয়টিই প্রকাশ্যে এসেছে। যে সমস্ত বাইরের শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থকে প্রধান্য দেয়, তারা কি দাবি করতে পারে যে তারা শান্তির নিশ্চয়তাদানকারী। এছাড়া ইসলামের সমালোচকরা পৃথিবীতে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার জন্য ইসলামকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে? তারা বর্তমান যুগের নৈরাজ্যের জন্য আঁ হযরত (সা.)কে দায়ী করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্পষ্ট থাকে যে, ইসলামী বিশ্ব হোক বা অন্যত্র, পৃথিবীতে যেখানে অরাজকতা রয়েছে, এর সঙ্গে ইসলামের শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং মূল কারণ হল একদিকে স্বার্থান্বেষী নেতা বা দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকদের স্বার্থ। দ্বিতীয় কারণ হল বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি। এর কারণ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির নিন্দনীয় ক্রিয়াকলাপ, যারা কেবল নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে ব্যগ্র। নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগে মুসলমান দেশগুলিই পৃথিবীতে অরাজকতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, অমুসলিম দেশগুলি এর সমাধান সূত্র উপস্থাপন করার পরিবর্তে সংকটময় পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তুলেছে। বলা হচ্ছে যে এই সব সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে ইসলামী শিক্ষা নাকি প্রশয় দিচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট থাকে যে এমন দাবির কোনও বাস্তবতা নেই। যেমনটি আমি বলেছি, রসুল করীম (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস, তিনিই সমগ্র মানবজাতির পালনকর্তা। কুরআন করীমের প্রথম সূরায় এবিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। অতএব এটি কি করে সম্ভব যে রসুল করীম (সা.) অসহিষ্ণুতার প্রসার করেছেন বা সমাজে ভেদাভেদের বীজ বপন করেছেন? বরং তিনি তো সারাটি জীবন বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমন্বয় ও সম্প্রীতির প্রসার করেছেন এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে, পারিবারিক জীবন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কেবল শান্তির উপরই গুরুত্ব আরোপ করে এসেছেন। তিনি কেবল শিক্ষায় দান করেন নি, বরং বাস্তবায়িত করেও দেখিয়েছেন। প্রথম থেকেই তিনি শান্তির বাণী প্রসার করেছেন এবং সহনশীলতা ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতির বিকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং মানবীয় মূল্যবোধ যেন সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রায় এই অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে যে প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন আর তারা অপরের ধর্মমতকে সহন করতেন না। কিন্তু নিরপেক্ষ ইসলামী ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয় যে এগুলি নিতান্তই মিথ্যা অভিযোগ। ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় মক্কায় মুসলমানেরা নিজেরাই অত্যাচারের শিকার ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, কারোর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানেরা ধৈর্য অবলম্বন করেছেন, কখনোই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। যত উপায়ে অত্যাচার করা যায় তার সবগুলিই সহ্য করার পর কিছু দুর্বল মুসলমান অন্য একটি দেশের দিকে হিজরত করেন, বর্তমানে যে দেশটি ইথিওপিয়া নামে পরিচিত। এর পরও ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি, বরং তাদের পিছু ধাওয়া করে সেই দেশের বাদশার কাছে পৌঁছে যায় আর তাঁর কাছে আবেদন করে যে

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: বেগ আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া, হরহরি, মুর্শিদাবাদ, (প:ব:)

বিবেকের স্বাধীনতা ও ইসলাম

সৈয়্যেদনা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ)।

অনুবাদক ঃ- আবু তাহের মন্ডল

(শেষ পর্ব)

এরপর ইউনিয়নের সভাপতির পক্ষ থেকে যে প্রেস রিলিজ তৈরী করা হয়েছিল তাও সকলের সম্মুখে পড়ে শোনানো হয়। আর টিভিতে যে ইনটারভিউ হয়েছিল তা খুবই ভাল ছিল। পুণরায় স্থানীয় মন্ত্রীর সহিত মিটিং করা হয়। জামাতীয় প্রচেষ্টায় অন্যদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যেখানে এর ভিত্তি ছিল সেখানে জামাতে আহমদীয়া প্রচুর কাজ করেছে। এই কার্টুন তৈরীর কারণ এই যে, ডেনমার্কে একজন ডেনিস লেখক একটি পুস্তক রচণা করেন যার অনুবাদ এই ছিল যে, "মহানবী (সাঃ) এর জীবন ও কোরআন" যেটি বাজারে এসেও গিয়েছিল। সাধারণ ভাবে এই গ্রন্থাকার মহানবী (সাঃ) এর কিছু ছবি তৈরী করে পাঠানোর জন্য বলেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে কিছু মানুষ ঐ ছবি গুলি বানিয়েছিলেন । কিন্তু তারা নিজেদের নাম এই জন্য প্রকাশ করেননি যে, এর ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হবে। যাইহোক এই পুস্তক ও সংবাদ পত্রের কার্টুনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়েছিল। যাইহোক এই প্রসঙ্গে ধারাবহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দরকার। যেখানে যেখানে এই পুস্তক পড়ার কারণে আপত্তি উত্থাপিত হচ্ছে সেখানে তার উত্তর দেওয়া অবশ্যক। কিন্তু ডেনমার্কে এ ধারণা ও বিদ্যমান আছে যে, তারা বলেন এমন কিছু ছবি আছে যা তাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়নি কিছু মুসলমান এইরূপ ছবি তৈরী করে মুসলিম বিশ্বকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে। জানিনা এ কথা কতটা সত্য ও কতটা মিথ্যা। কিন্তু আমাদের এই সমকালীন প্রচেষ্টা তাদের অনুভূতীর সৃষ্টি করেছে। এটি সেই তিন মাস পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল। অথচ আজ তাদের গোচরে এসেছে।

যেমন আমি বলেছিলাম যে, মহানবী (সাঃ) এর জীবনের বিভিন দিক বর্ণনা করা খুবই জরুরি । বিশেষ করে ইসলাম প্রসঙ্গে যেখানে যুদ্ধ উন্মাদনার ধারণা পোষণ করা হয়। এর প্রমাণ সহ প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক। ইতিপূর্বেও আমি বলেছিলাম যে, সংবাদ পত্র ও পত্রিকাতে অধিক সংখ্যায় লিখতে থাকুন। সংবাদপত্রের লেখকদেরও মহানবী (সাঃ) এর জীবন পুস্তক দেওয়া যেতে পারে।

আহমদী যুবকদেরকে সাংবাদিকতা করা দরকার

ভবিষ্যতের জন্য এটাও একটি সুবিবেচনা। জামাতকে প্লান করা দরকার যে, আহমদী যুবকরা সাংবাদিকতায় যেন বেশি বেশি অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে। বিশেষ করে ঐ ব্যক্তিদের এই দিকে বেশি আকৃষ্ট রাখে সংবাদ পত্রের মূল জায়গায়, আমাদের লোক থাকা দরকার। কারণ এই ধরনের সমস্যা সময় সময় মাথা চাড়া দিতেই থাকবে। যদি সংবাদ মাধ্যমের সহিত আমাদের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে এই প্রকার অনর্থক অব্যবস্থার প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হবে। এর পরেও যদি কেউ বিরত না হয় তাহলে সে ঐ মানুষের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদের উপর আল্লাহতা'লা ইহলোকে ও পরলোকে অভিসম্মাত দেন। যেমন আল্লাহ বলেন

(ইন্নাল্লাযিনা ইউ'যুনাল্লাহা ওয়া রাসুলাহু লায়ানাহুমুল্লাহু ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া আআদ্দা লাহুম আযাবামমুহিনা)

(সূরা আহযাব : ৫৮)

অর্থ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালেও এবং পরকালেও তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তত করে রেখেছেন। এ আদেশ শেষ হয়নি । আমাদের নবী (সাঃ) জীবিত নবী। তাঁর (সাঃ) এর শিক্ষা জীবন দানকারী শিক্ষা। তাঁর (সাঃ) এর বিধান প্রত্যেক যুগের সমাধানের বিধান। তাঁর (সাঃ) এর অনুসরণে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তি হয়। যে কারণে গুরুতর কষ্ট তাঁর (সাঃ) এর মান্যকারীদের দেওয়া হচ্ছে এটা তাদের উপরও বর্তায়। আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য। তিনি দেখছেন যে তাঁরা তাদের সহিত কিরূপ আচরণ করছেন।

অতএব জগৎবাসীকে অবগত করানো আমাদের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য । তাদের বোঝাতে হবে যে, যে কষ্ট তোমরা আমাদের দিচ্ছ তার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ আজও রাখেন এই জন্য আল্লাহ ও তার রসুলের মনে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাক। কিন্তু যেখানে ইসলামের শিক্ষা ও হুজুর (সাঃ) এর আত্মজীবনীর কথা বলা হয় সেখানে নিজেদের আমলকেও পরিশুদ্ধ করতে হবে। কারণ আমাদের আমলই জগতবাসীর মুখকে বন্ধ করবে। আর এটাই তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যেমনটি আমি রিপোর্টের মধ্যে বলেছিলাম, যে সেখানে একজন মুসলমান আলেমের উপর এই মুনাফেকি দোষ আরোপ করা হচ্ছিল যে, সে এখানে আমাদেরকে যে কথা বলে সেখানে তাদেরকে অন্য কথা বলে। উৎসাহিত করে। সম্ভবত আমি কোন এক রিপোর্ট পড়েছিলাম। যাইহোক আমাদের অন্তর এবং বাহির, কথা এবং কর্ম এক করে বাস্তবে আমল করে দেখাতে হবে।

ঝান্ডা জ্বালিয়ে এবং ভাঙচুর করে মহানবী (সাঃ) এর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় না

বিভাজন না করে আমি অন্যান্য মুসলমানদেরকেও বলছি সে আহমদী হোক বা না হোক শিয়া হোক বা না হোক সুন্নি হোক বা মুসলমানদের অন্য ফেরকার সহিত সম্পর্কযুক্ত হোক। যখন মহানবী (সাঃ) এর উপর আক্রমণ হবে তখন ক্ষণিকের আবেগ প্রকাশের জন্য ঝান্ডা জ্বালান ভাঙচুর, দূতাবাসের উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে নিজেদের কর্মের সংশোধন করুন, যাতে বিরুদ্ধবাদীরা আঙুল ওঠানোর সুযোগই না পায়। এই আগুন লাগিয়ে কি মনে করছেন যে, মহানবী (সাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদা এতটুকুই গুরুত্ব যে ঝান্ডা জ্বালিয়ে অথবা দূতাবাসের জিনিস পত্র জ্বালিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন? তা নয়। আমরা তো ঐ নবীর (সাঃ) এর মান্যকারী, যিনি আগুন নেভানোর জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি প্রেমের দূত হয়ে এসেছিলেন তিনি শান্তির যুবরাজ ছিলেন। অতএব কোন শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে মানুষকে বোঝান এবং তাঁর (সাঃ) অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রসঙ্গে অবগত করান।

একজন আহমদীর প্রকৃত প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া দরকার?

আল্লাহতা'লা সকল মুসলমানদের জ্ঞানও বোঝার শক্তি দান করুন। কিন্তু আমি আহমদীদেরকে বলছি যে, জানিনা তাদের জ্ঞান ও বোঝার শক্তি হবে কি হবেনা। তবে আপনাদের মধ্য হতে প্রতিটি বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ এবং মহিলারা এই জঘন্য কার্টুন প্রকাশের বিরুদ্ধে এমনই আগুন লাগানোর কর্মে এমনই ব্রতী হোন যা কখনই নিভে যাওয়ার নয়। সে যেন কোন দেশের ঝান্ডা ও বিষয় সম্পদ জ্বালানোর আগুন না হয়। যা কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিভে যায়। তাদের লোকেরা বড় উদ্যম নিয়ে আগুন লাগিয়ে এমনি দাঁড়িয়ে আছে। (পাকিস্তানের একটি ফটো ছিল) যেন তারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে এই আগুন তো পাঁচ মিনিটে বন্ধ হয়ে যাবে । আমাদের আগুন এমন হওয়া দরকার যা সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকবে। সেই আগুন মহানবী (সাঃ) এর প্রেম ও ভালবাসার আগুন যা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে জগতবাসীকে দেখানোর আগুন। যা আপনাদের মনে প্রাণে সর্বসময়ে প্রজ্বলিত থাকবে। এই আগুন এমনই হবে যা দোয়াতে পরিবর্তিত হতে থাকবে, এবং তার শিক্ষা সর্বক্ষণ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাতে থাকবে।

নিজের বেদনাকে দোয়াতে পরিবর্তিত কর এবং মহানবী (সাঃ) উপর খুব বেশি বেশি দরুদ পাঠ কর।

অতএব এই সেই আগুন যা প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের মনে প্রজ্বলিত করতে হবে এবং নিজেদের বেদনাকে দেয়াতে পরিবর্তিত করতে হবে। এর জন্য মহানবী সাঃ) একমাত্র মাধ্যম। নিজের দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

জন্য এবং আল্লাহর প্রেম পাওয়ার জন্য দুনিয়ার অসৎ কর্ম হতে বাঁচার জন্য এই ধরণের যে সকল ফেৎনার উদ্ভব হয় তা থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য মহানবী (সাঃ) এর ভালবাসা জাগিয়ে রাখার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতকে পরিপাটি করার জন্য, মহানবী (সাঃ) এর উপর অসংখ্য দরুদ পাঠ করা দরকার। বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করা দরকার। এই পরিপূর্ণ ফেৎনার যুগে নিজেকে মহানবী (সাঃ) এর ভালবাসায় ডুবিয়ে রাখার জন্য, এবং নিজের সন্তান সন্ততিকে আহমদীয়াত ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রত্যক আহমদীকে আল্লাহতা'লার নির্দেশের উপর শক্ত ভাবে আমল করা দরকার।

(ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবিয়্যি ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা) (সূরা আহযাব : ৫৭)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তার ফরিস্তারাও (এ নবীর জন্য দোওয়া করে) হে যারা ঈমান এনেছ তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ এবং অনেক সালাম পাঠাও।

(প্রদত্ত জুম্মার খোতবা ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ বাইতুল ফুতুহ মসজিদ, লণ্ডন, হাওয়ালা উসওয়ায়েরসুল (সাঃ) আউর খাকো কি হকিকত, দ্বিতীয় এডিশান, পৃষ্ঠা ৯-২০)

অন্যের আবেগের সহিত খেলা করাকে মানবীয় অধিকার ও বাক স্বাধীনতা বলে না

হুজুর (আইঃ) পাশ্চাত্যকেও অন্যের আবেগের সহিত খেলা করাকে সাবধান করেছেন । এবং সতর্ক ও করেছেন যে, এটি আল্লাহতা'লার আযাবকে আমন্ত্রণ দেওয়ার নামান্তর। তিনি বলেন,

যেখানে আমরা জগতবাসীকে বুঝাই যে, কোন ধর্মের পবিত্র ব্যক্তি প্রসঙ্গে কদর্য বাক্যের বহিঃপ্রকাশ স্বাধীনতার কোন অংশের মধে পড়ে না। আপনারা যে সামাজিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতার নামে চ্যাম্পিয়ান হয়ে অন্যের আবেগের সহিত খেলছেন। এটা সামাজিক অধিকারও নয়, আর বাক স্বাধীনতাও নয়। প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিসীমা থাকে এবং চারিত্রিক রীতিনীতি থাকে এইরূপে সে যে ধরনেরই শাসন হোক না কেন তাদেরও কিছু আইন কানুন হয়। স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চিতরূপে এই অর্থ নয় যে, অন্যের আবেগের সহিত খেলা করা যায়, ও তাকে কষ্ট দেওয়া যায়। যদি এটাই স্বাধীনতা হয় যার উপর পাশ্চাত্য জাতীর গর্ব। তাহলে এই স্বাধীনতা উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার নয় বরং আবনতির দিকে নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা।

****

৯ পাতার পর....

মুসলমানদেরকে যেন জোর করে মক্কায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেন এবং সেখান থেকে বের করে দেন যাতে তারা মক্কায় তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে পারে আর ইসলামের প্রসার না হয়। সেই কাফেরদের দল বাদশাহকে বলে, মুসলমানেরা একটি নতুন ধর্ম তৈরী করেছে আর মূর্তি পূজাকে গালমন্দ করে। তারা অভিযোগ আরোপ করে যে মুসলমানেরা অরাজকতা সৃষ্টি করছে এবং সমাজের শান্তি নষ্ট করছে। বাদশাহ যখন মুসলমানদের আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার নির্দেশ দিলেন, তখন মুসলমানেরা সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রভুপ্রতিপালক এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর নিজেদের ঈমান প্রকাশ করে বলেন, তারা সেই খোদারই ইবাদত করেন, কিন্তু সমগ্র জাতি এবং সমাজের জন্য শান্তির অভিলাষী। এবং এবিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখেন যে ভিন্ন মতবাদ ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকা কাম্য। তারা নিজেদের ইমানের কথা উল্লেখ করে আরও বলেন, ধনী ও সামর্থবান মানুষদের দুর্বলদের অধিকার আত্মসাৎ করার অধিকার থাকা উচিৎ নয়। আর অভাবগ্রস্তদেরও ধনীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত নয়। (ক্রমশ:....)

M.Sc. Physics+ B.Ed. শিক্ষক চাই

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এর অধীনে নাযারত তালিম একটি শূন্যপদে নিয়োগোর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। নিম্নোলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

১) ইউজিসি অনুমোদিত যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড, এম.এস.সি ফিজিক্স-এ পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

২) কোন উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে অন্ততপক্ষে দুই বছর পদার্থবিদ্যায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩) প্রত্যাশীর বয়স ২২ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৪)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে।

৫) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে।

৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে।

৬) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

৭) বদর পত্রিকায় ঘোষণার দুই মাস পর পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে।

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

৯) আবেদন পত্র পূর্ণ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ক্রিয়ান্বিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

কাদিয়ানের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুস সানাত-এ এয়ারকান্ডিশন -এর একজন প্রশিক্ষক চাই।

দারুস সানাত-এ এয়ারকান্ডিশন -এর কাজের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর স্থায়ী পদে একজন কর্মী নিয়োগ করা হবে। দারুস সানাআত বিভাগে সারা ভারত থেকে আসা ছাত্রদেরকে এয়ার কান্ডিশনের কাজ হাতেকলমে শেখানো তাঁর দায়িত্ব হবে। প্রত্যাশীকে অফিস কাজের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে প্রয়োজন অনুসারে কাজে ডাকা হতে পারে। অভিজ্ঞ প্রত্যাশীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

*প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিদেনপক্ষে ITI/ NSIC বা তার সমতূল্য ডিপ্লোমা থাকতে হবে। * জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। * প্রত্যাশীকে তত্ত্ববিদ্যা শেখানোর পাশাপাশি হাতেকলমে কাজ করে দেখানোর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। * কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। * লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। *প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।* প্রত্যাশীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। * উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন। এই ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে। * ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের আবেদনপত্র জামাতের সদর/মুবাল্লিগ ইনচার্জ/জেলা আমীরের প্রত্যায়িত স্বাক্ষর ও মোহর সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। * ইন্টারভিউ-এর সময় আসল সনদ গুলি সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 16 April , 2020 Issue No.16

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার পর...

এটা ভাবিনি যে, আমাকে জনসাধারণের উপর প্রশাসক করে দেওয়া হয়েছে। আমি তো পূর্বেও সেবক ছিলাম এবং আজ গভর্নর হওয়ার পরও একজন সেবক। আমি জনগণের কাজে সাহায্য করে তৃপ্তি পেতাম। এই সরলতা ও সহজ ভাবের জন্য একদিন এক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হলাম। এমন এক ঘটনা ঘটল যে, এক ব্যক্তি যিনি অপরিচিত ছিলেন এবং কোন অন্য অঞ্চল থেকে মাদায়েন এসেছিলেন, তার মালপত্র উঠানোর জন্য মুটের প্রয়োজন হোল। আমি সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই অপরিচিত ব্যক্তি আমার সাদাসিধে অবস্থা দেখে আমাকে মজুর অনুমান করে বললেন যে, আমার এই মাল-পত্র উঠিয়ে অমুক জায়গায় পৌঁছে দাও। আমিও তাকে বলিনি যে, আমি এখানকার গভর্নর এবং চুপ-চাপ মালপত্র উঠিয়ে তার সাথে রওনা হলাম। শহরের লোকেরা যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন ঐ ব্যক্তিকে আসল কথা অবগত করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি বিচলিত হল এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল যে, আমি অযথা আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, কোন ব্যাপার নয়, এখন তো আমি তোমার মালপত্র গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসব। অতএব হাজারও পিড়াপিড়ী করা সত্বেও আমি তা-ই করলাম। জনসাধারণ এই ব্যাপারে বিস্মিত হলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের যুগে শেষ বৎসরে আমার বিবাহ করার চিন্তা-ভাবনা হল এবং এই অনুভব হল যে, একাকীত্ব দূর করার জন্য একজন সাথী হওয়া আবশ্যক। এই ভাবে আমি বনি কুন্দা বংশে বিবাহ করলাম। আমার স্ত্রীর নাম ছিল বকিরা এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সে এক পূণ্যবতী ও সাধারণ কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে একজন বিচক্ষণ মহিলা ছিল।

আমি তো এতদিন পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলাম, এখন এই দায়িত্বভার বহন করার প্রচেষ্টা করতে লাগলাম। ইতিপূর্বে আমার মনে গৃহ নির্ম্মান করার চিন্তা-ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন আমি একটা ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মান করলাম, যাতে সানন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তাই হল। যদিও আমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তথাপি রসুলুল্লাহর নিকট সম্বন্ধ হওয়ার কারণে হযরত ওমর (রাঃ) আমার পেনশন বদরী সাহাবাদের সমান নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। এমনি আমার জীবন আল্লাহর অনুগ্রহে খুব সুন্দরভাবে কাটছিল। এখন অতীতের কঠিন পরিস্থিতি শুধুমাত্র স্বপ্ন হয়ে গেছে যে, কেমন করে ইরান থেকে রওনা হয়ে আরব ভূমিতে পৌঁছেছিলাম। স্বাধীন থেকে দাসত্বে এবং পুনরায় মালিক (সাঃ) এর মাধ্যমে দাসত্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীন যাত্রা যদিও দীর্ঘ ছিল। কিন্তু এখন জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে এইসব কিছুই শুধু স্মৃতি হয়ে রয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং জীবন সফল ও নিশ্চিন্তে অতিবাহিত হচ্ছিল"।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর জীবন কাহিনী আপনারা শুনলেন। তিনি সেই মহামানব যিনি শুধু আল্লাহতা'লার উপর আস্থা ও নির্ভর করে সেই পথ বেছে নিয়েছিলেন, যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক পথ ছিল। নিজের সব কিছু হাতের নাগালের মধ্যে রেখে সত্য ধর্ম ও সত্য নবীর সন্ধানে বাহির হয়ে গিয়েছিলেন, পথের কোন অসুবিধা তার সংকল্প ও উদ্দীপনাকে হ্রাস করতে পারে নি। অতঃপর বিশ্ববাসী দেখেছে, আল্লাহতা'লা তার সত্যিকার আবেগ অনুভূতি বিনষ্ট হতে দেন নি। তিনি শুধুমাত্র রসুলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎলাভে কৃতকার্য হন নি বরং হুজুর (সাঃ) তাঁর প্রতি স্নেহশীল হয়ে 'আহলে বায়েত' এর মধ্যে স্বীকৃতি দান করেন। শুধু এটাই নয় পক্ষান্তরে হুজুর (সাঃ) আল-জুমুয়ার তফসীর প্রসঙ্গে তাঁর কাঁধে হাত রেখে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে,

"যদিও ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যায় তাহলে তার [সালমান ফারসী (রাঃ)] জাতির এক ব্যক্তি সেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে"।

যেমন আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্ত্বায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যিনি পারস্য বংশীয় ছিলেন। তাঁর বংশধর ইরান থেকে 'হিজরত' (দেশত্যাগ) করে ভারত বর্ষে বসতি স্থাপন করেন। মোটকথা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) যদিও দেরীতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং প্রাথমিক দিকে অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগ-উচ্ছাসকে মর্যাদা দান করে উল্লেখযোগ্য সেবা করার সামর্থ্য লাভ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং এখানেই তাঁর বিয়ে বনু কান্দাহ গোত্রের একজন সম্মানীয় মহিলা বকিরার সাথে হয়েছিল। হিজরী ৩৩ সন -এ ভ্রাতৃত্বের ফলে তার ভাই হওয়া রসুল (সাঃ) এর মহান সাহাবী হযরত আবু দরদা (রাঃ) দামেস্কে (সিরিয়া) পরলোকগমন করেন। তখন তিনি শোক-জ্ঞাপন করার জন্য সিরিয়া গমন করেন।

৩৫ হিজরীতে তাঁর মৃত্য হয় মাদায়েনে । হযরত সাদ বিন আবি ওকাস (রাঃ) জানাযার নামায পড়ান এবং মাদায়েনে অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর মাজার এখনও সেখানে বিদ্যমান এবং এই অঞ্চলকে "সালমান পাক" বলা হয়। এই স্থানে আগত দর্শনার্থীরা দোয়া করার জন্য তাঁর মাজারে অবশ্যই যায়।

তাঁর উত্তরাধিকারীর মধ্যে স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। একটি কন্যার বিবাহ ইসপাহানে হয় যদিও বাকী দুজনের মিশরে হয়।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর এই সম্মান অনেক বড় ছিল যে, তিনি পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে সব চেয়ে প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁর 'নেকি' (পূণ্য), জ্ঞান ও 'তাকওয়া' (খোদাভীতি)-র কারণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর খলিফারা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর সাথে ভালোবাসা এবং স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁর জীবন খোদাতা'লা ও তাঁর রসুল (সাঃ) এর প্রেমের এক জীবন্ত ছবি ছিল। এটা আল্লাহতা'লার প্রতি খাঁটি ভালোবাসা, প্রেম ও তার সাথে মিলিত হওয়ার প্রগাঢ় উন্মাদনা ছিল। যা তাকে নিজ গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ পরিবেশ ত্যাগ করে জনবসতি ও অরণ্যে ঘোরাফেরা করতে বাধ্য করেছিল।

'ইশ্‌ক হ্যায় জিস সে হোঁত্বয় ইয়ে সারে জঙ্গল পুর-খতর।

ইশ্‌ক হ্যায় জো সর ঝুকা দে যের তেগ আব্‌দার'।

(অর্থাৎ প্রেমই এমন যা সমস্ত দুর্গম অরণ্য অতিক্রম করতে বাধ্য করে। প্রেমই এমন যা শাণিত তরবারীর সম্মুখে মস্তকাবনত করে দেয়)

তাঁর অনুসন্ধান যেহেতু খাঁটি ছিল তাই আল্লাহতা'লা তার খাঁটি মনোবাঞ্ছা বৃথা যেতে দেন নি এবং তাঁকে সেই নবীর চরণতলে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যিনি সমস্ত নবীগণের সর্দার (নেতা) ছিলেন। তিনি এখানেও এমন পূর্ণতম দাসত্ব অবলম্বন করেছিলেন যে, দাসত্বের ধাপ থেকে উন্নতি করতে করতে রসুলুল্লাহর 'আহ্‌লে বায়েত' এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সত্য কথা-এই ভালোবাসা তো ভাগ্যবানরা পেতে পারে এবং অবশ্যই হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সমাপ্ত

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir